গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭১ বর্ষ ১৮ সংখ্যা | ১৪ - ২০ ডিসেম্বর ২০১৮ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা

রথযাত্রার পাল্টা পবিত্রযাত্রা! জনগণের কী কল্যাণ?

সাম্প্রদায়িকতার বিষধর সাপ এ রাজ্যেও ফোঁস করে উঠেছে। রাজ্য জুড়ে সাম্প্রদায়িক উস্কানি তৈরির জন্য বিজেপির রথযাত্রা কোর্টের সিদ্ধান্তে আপাতত স্থগিত হলেও তা বাতিল হয়নি। রাজ্যের তিনটি জায়গা থেকে যাত্রা শুরু করে রথগুলি ঘোরানোর কর্মসূচি রয়েছে রাজ্যের প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রে।

কোনও একটি দল যদি রথযাত্রা করে তবে অসুবিধা কোথায়? এ তো তাদের দলীয় কর্মসূচি! ঠিকই, কোনও একটি দল কী কর্মসূচি নেবে তা তাদের নিজস্ব বিষয়। সেখানে অন্যদের বিরোধিতা করার কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু এক্ষেত্রে বিষয়টা এত সহজ নয়। তৃণমূলের অপশাসনের প্রতিবাদ করতেই নাকি এই রথযাত্রা। তাহলে রাজনৈতিক ভাবে অর্থাৎ রাজনৈতিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে তা করাটাই তো ছিল স্বাভাবিক। তা না করে বিজেপি রথযাত্রার মতো একটি ধর্মীয় কর্মসূচি নিল কেন?

তৃণমূলের অপশাসনের কথা বিজেপি নেতারা বুড়িছোঁয়া করে বললেও আসলে তাদের লক্ষ্য ধর্মের ভিত্তিতে জনগণকে বিভক্ত করা, সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালানো। না হলে বাস্তবে রাজ্যের মানুষ যে জ্বলন্ত সমস্যাগুলিতে জর্জরিত, যা তৃণমূল শাসনে তীব্রতর হয়েছে, তার সমাধানের দাবি নিয়ে তাঁরা আন্দোলন গড়ে তুলতেন, ধর্মরথ বের করতেন না। যদিও এ রাজ্যের মানুষের মানসিকতার কথা মনে রেখে বিজেপি নেতারা একে দেশের অন্য রাজ্যগুলির মতো রথযাত্রা না বলে 'গণতন্ত্র বাঁচাও যাত্রা' নাম দিতে বাধ্য হয়েছেন। ১৯৯০ সালে বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানির নেতৃত্বে দেশ জুড়ে রথযাত্রার কথা অনেকেরই মনে আছে। ১৯৯২ সালে পাঁচশো বছরের পুরনো স্থাপত্য বাবরি মসজিদ ভেঙে দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে ভোটে ফসল তোলার জমি তৈরি করতেই ছিল এই রথযাত্রা। যে পথ দিয়ে সে রথ গিয়েছিল সর্বত্রই বিজেপি-আরএসএস বাহিনী সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়াতে ছড়াতে গিয়েছিল। বহু জায়গাতেই দাঙ্গা বাধিয়েছিল। এ রাজ্যে পুরুলিয়ার ঝালদাতে রথ চলাকালীন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর কথা রাজ্যের মানুষ ভোলেনি। এবারও সেই উন্মাদনা তৈরিই তাদের লক্ষ্য।

বিজেপি নেতারা তাঁদের বক্তৃতায় বারবার বলছেন, আমরা ক্ষমতায় এলে রাজ্য থেকে অনুপ্রবেশকারীদের ঘাড় ধরে বের করে দেব। জীবনের হাজারটা সমস্যায় জর্জরিত মানুষকে তাঁরা বোঝাচ্ছেন, এই সব সমস্যার জন্য অনুপ্রবেশকারীরা

পাঁচের পাতায় দেখুন

মৈপীঠ সংহতি দিবসে এলাকায় বিশাল জনসভা

৯ ডিসেম্বর মৈপীঠ সংহতি দিবসে দক্ষিণ ২৪ পরগণার মৈপীঠে শনিবারের বাজারে বিশাল জনসমাবেশের একাংশ। সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার। বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী।

'ওদের আক্রমণ যত বাড়বে আমাদের আন্দোলন তত জোরদার হবে'

মৈপীঠের নির্যাতিতা পার্টিকর্মী কমরেড কবিতা পাত্র

কুলতলির মৈপীঠে বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এস ইউ সি আই (সি) ১১টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও মাত্র একটি আসনে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস সিপিএমের ৭জন ও এস ইউ সি আই (সি)-র দু'জন সদস্যকে অনৈতিকভাবে ভাঙিয়ে নিয়ে বোর্ড গঠন করে। কিন্তু ২০ নভেম্বর উপসমিতি নির্বাচনে এস ইউ সি আই (সি) জিতে

দুয়ের পাতায় দেখুন

ফ্রান্সের জনগণ দেখাচ্ছে গণআন্দোলনই বাঁচার পথ

ফ্রান্স এখন গণবিক্ষোভে উত্তাল। মূলত জ্বালানি গ্যাসের চড়া দামের বিরুদ্ধে রাস্তায় জনজোয়ার। ক্ষোভের তরঙ্গ আছড়ে পড়েছে দেশের রাজপথগুলিতে। জ্বালানি গ্যাসের দাম কমানোর দাবি ছাড়াও জনবিরোধী নানা সরকারি নীতির বিরুদ্ধে স্লোগান উঠছে। প্রেসিডেন্ট মাকরঁ-র পদত্যাগের দাবিও তুলছে বিক্ষুব্ধ মানুষ। পুলিশের লাঠি, কাঁদানে গ্যাস, জলকামান, গ্রেপ্তারি, এমনকী মৃত্যু উপেক্ষা করে চলা এই উত্তাল বিক্ষোভের চড়া সুর অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয়নি মাকরঁ-র পক্ষে। আন্দোলনকারীদের দাবির কাছে নতি স্বীকার করে বিক্ষোভের তিন সপ্তাহের মাথায় আগামী ছ'মাস জ্বালানি গ্যাসের দাম না বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি, দিয়েছেন বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনার আশ্বাসও। কিন্তু শান্ত হয়নি জনতার ক্রোধ। এইসব প্রতিশ্রুতি যে আন্দোলনে লাগাম পরাবার কৌশল মাত্র, এ কথা বুঝতে ভুল করেনি তারা। প্রতিশ্রুতি মেলার পরেও ৮ ডিসেম্বর

৮ ডিসেম্বর। প্যারিসে বিক্ষোভকারীদের বিশাল সমাবেশ

দুয়ের পাতায় দেখুন

চাকরি হল কোথায় যে রাজ্যে বেকারত্ব ৪০ শতাংশ কমে গেল

২২ নভেম্বর বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গে বেকারত্ব ৪০ শতাংশ কমেছে'। কী করে এই বেকারত্ব কমল? বেকাররা কোথায় চাকরি পেল? মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ১০০ দিনের কাজ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সহ নানা ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ বেড়েছে।

বছরে মাত্র ১০০ দিনের কাজ দেওয়ার যে প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকার এনেছে, তাতে কোনও রাজ্যেই ১০০ দিন কাজ হয় না। বেশিরভাগ রাজ্যেই ২০-২৫-৩০ দিনের মধ্যে কাজ সীমাবদ্ধ থাকে। আবার একই পরিবারের সকল বেকারও কাজ পান না। কাজ ছিটেফোঁটা যা জোটে তাতে মজুরি সামান্য, এবং তা নিয়েও চলে শাসক দলের দুর্নীতি। কবে কাজ জুটবে তাও অনিশ্চিত। এই প্রকল্পে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বরাদ্দও কমিয়ে দিয়েছে। এ হেন একটি কর্মপ্রকল্পকে মুখ্যমন্ত্রী বেকারত্ব কমার উদাহরণ হিসাবে বিধানসভায় বিবৃতি দিলেন— এতেই পরিষ্কার বেকার সমস্যা সমাধানের কোনও দিশাই শাসক তৃণমূলের নেই।

বস্তুত সিপিএমের ৩৪ বছরের শাসন থেকে তৃণমূলের ৭ বছরের শাসন, এই ৪১ বছরে রাজ্যে কোনও কারখানা হয়নি। এই চার দশকে বহু শ্রমনিবিড় শিল্প বন্ধ হয়েছে। সরকারি দপ্তরে হাজার হাজার শূন্যপদে নিয়োগ হয়নি। বিভিন্ন দপ্তরে চলছে পদ বিলোপ। স্থায়ী চাকরি বলতে বাস্তবে কিচ্ছু থাকছে না। সরকারি-বেসরকারি ক্ষেত্রে ডাউনসাইজিং

তিনের পাতায় দেখুন

ফ্রান্স দেখাচ্ছে গণআন্দোলনই বাঁচার পথ

একের পাতার পর

আবার পথে নামে ফ্রান্সের মানুষ। গোটা দেশের শহর নগর কেঁপে ওঠে হলুদ জ্যাকেট পরা ৩১ হাজারেরও বেশি বিক্ষোভকারীর স্লোগানে। এই হলুদ জ্যাকেট হল সে দেশের গাড়িচালকদের পোশাক। এ দিন ভোরবেলা থেকেই প্যারিসের শঁজে লিজে সমবেত হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে মানুষ। আন্দোলনের আঁচ এড়াতে আগে থেকেই বন্ধ রাখা হয়েছিল প্যারিসের দর্শনীয় স্থানগুলি। বাতিল করা হয়েছিল নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শহর যেন স্তব্ধ কৌতূহলে অপেক্ষা করছিল আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি বুঝে নিতে। এদিন বিক্ষোভকারীদের সংগ্রামী মেজাজও ছিল তুঙ্গে। রাস্তায় খাড়া করা ব্যারিকেডগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেয় তারা। স্লোগানে স্লোগানে ক্ষোভ উগরে দেয় প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে। গ্রেপ্তার হয় হাজারেরও বেশি মানুষ। পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষ হয় বিক্ষোভকারীদের।

বোঝাই যায়, অনেকদিন ধরে মানুষের বুকে ক্ষোভের বারুদ জমতে জমতে আজ বিশাল চেহারা নিয়েছে। শুধু জ্বালানি গ্যাস নয়, ফ্রান্সে বেড়ে চলেছে সমস্ত জিনিসের দাম। বাড়িভাড়া, বিদ্যুৎ, তেলের মতো নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির পিছনে ক্রমাগত খরচ বাড়ছে ফ্রান্সের মানুষের। গোটা দুনিয়ার অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশগুলোর মতো ফ্রান্সেও আজ ভয়াবহ বাজার সংকট। একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কল-কারখানা। বেকারত্বের হার আকাশ ছুঁচ্ছে। ২০০০ থেকে ২০০৭-এর মধ্যে সে দেশে চাকরি কমেছে ৬৩ শতাংশ। চাষিদেরও ভয়ানক দুরবস্থা। চাষের খরচ বেলাগাম, অথচ কৃষিপণ্যের দাম নেই। ধারদেনায় ডুবে আছে কৃষকরা। ফ্রান্সে প্রতি তিন দিনে একজন চাষি বাঁচার পথ খুঁজে না পেয়ে আত্মহত্যা করে। গ্রাম ও শহরগুলিতে মধ্যবিত্তরাও ক্রমশ প্রান্তিকে পরিণত হচ্ছে। গ্রামীণ হাসপাতালগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পৌর বাজেটে বরাদ্দ ক্রমাগত কমানো হচ্ছে। ফলে চিকিৎসার সুযোগ থেকে শুরু করে অন্যান্য সরকারি প্রকল্পের সুযোগসুবিধা পাচ্ছে না সাধারণ মানুষ, সন্তানদের লেখাপড়া শেখানো কঠিন হয়ে পড়ছে, অথচ করের বোঝায় নাভিশ্বাস উঠছে।

বিগত দিনগুলিতে সরকারের শ্রমিকবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ফেটে পড়েছিল ফ্রান্সের শ্রমিক-কর্মচারীরা। ঘরভাড়া ভাতা ও হাসপাতাল বন্ধ করে দেওয়ার সরকারি নীতির প্রতিবাদে পথে নেমেছিল তারা। তারপর দীর্ঘদিন ধরে সে দেশে চলেছে রেল-কর্মচারীদের ধর্মঘট। বস্তুত, পুঁজিবাদী শোষণ জুলুম, গরিবি বেকারির জ্বালায় অতিষ্ঠ মানুষ একটু রেহাই পেতে অনেক আশা নিয়ে গত নির্বাচনে দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল রিপাবলিকান ও সোস্যালিস্ট পার্টির প্রার্থীদের পরাজিত করে তুলনায় নতুন এক রাজনৈতিক দলের নেতা ইমানুয়েল মাকরঁকে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত করে। স্বভাবতই তাদের আশা পূরণ হয়নি। কারণ, স্লোগান যতই নিত্যনতুন হোক, সরকার বদলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শোষণমূলক চরিত্র বদলানো যায় না। ফলে মাকরঁর আমলেও ধনীদেরই সুরাহা মিলেছে, আর গরিবের ওপর চেপেছে করের বোঝা। বেড়ে চলেছে ধনী-গরিবে বৈষম্য। প্যারিসে এ দিনের বিক্ষোভে সামিল শ্রমজীবী এক যুবকের মুখে তাই শোনা গেছে অভিযোগ— 'সরকার আমাদের কথা শোনে না, আমাদের গুরুত্ব দেয় না।' দাবি উঠেছে, গরিবকে রেহাই দিয়ে ধনীদের উপর কর বাড়াক সরকার।

সমগ্র ইউরোপই আজ ফুঁসছে। ইতিমধ্যেই ফ্রান্সের বিক্ষোভের আঁচ ছুঁয়েছে প্রতিবেশী বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডসের মানুষকে। সেখানেও সরকারবিরোধী স্লোগানে সোচ্চার মানুষ পথে নেমেছে। নেদারল্যান্ডসের রটারডাম শহরে এক বিক্ষোভকারী বিরক্তি প্রকাশ করে মন্তব্য করেছেন, 'ছোটবেলা থেকে যেসব সামাজিক সুযোগসুবিধা পেয়ে বড় হয়েছি, আজ আর সেগুলোর কোনটাই নেই। সরকার সাধারণ মানুষের কথা ভাবে না।' বেলজিয়ামে বিক্ষোভকারীদের উপর কাঁদানে গ্যাস চালিয়েছে পুলিস।

পুঁজিপতি শ্রেণির ধামাধরা রাজনৈতিক দলগুলির জনবিরোধী চেহারায় ক্ষুব্ধ ফ্রান্স সহ ইউরোপের বহু দেশের মানুষ জীবনের জ্বালায় জর্জরিত হয়ে রাজনৈতিক শক্তির ভূমিকার অপেক্ষায় বসে না থেকে একটার পর একটা স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। যেকোনও মূল্যে এই অসহনীয় জীবনযন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে চায় তারা। তাদের সর্বাত্মক দুর্দশার আসল কারণ যে বিদ্যমান এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, এ কথা স্পষ্টভাবে না বুঝলেও এটুকু তারা বুঝেছে যে শুধু গ্যাসের দাম না বাড়ানোর সরকারি প্রতিশ্রুতিতে কাজ হবে না। তাই প্রেসিডেন্টের প্রতিশ্রুতিতে প্রাথমিক ভাবে দাবি আদায় হলেও আন্দোলনে ভাটা পড়েনি ফ্রান্সে। পথে নেমে নিজের শ্রেণিগত ঐক্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বিপুল শক্তির পরিচয় পেয়েছে মানুষ। সেই শক্তি দিয়ে আসলে পুঁজিবাদী শোষণের জগদ্দল পাথরটাকেই সরিয়ে দিতে চাইছে তারা। কিন্তু সঠিক পথের সন্ধান তাদের জানা নেই। যতদিন না সঠিক রাজনৈতিক শক্তির নেতৃত্বে পুঁজিবাদ উচ্ছেদের লক্ষ্য নিয়ে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে তারা লাগাতার আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হবে, ততদিন সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না। বারবার জনবিক্ষোভের ঢেউ আছড়ে পড়বে মাঠে-ময়দানে, হয়তো দু-একটা দাবি আদায়ও হবে, কিন্তু শোষণ থেকে মুক্তি মিলবে না।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের মূল্যবান উক্তির কথা। ১৯৭৪ সালে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠা দিবসের এক সভায় তিনি বলেছিলেন, " ... পেট বড় বালাই। অত্যাচার শোষণ যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাবে তখন তারাও বোমার মতো ফেটে পড়তে বাধ্য হবে, আন্দোলন করতে বাধ্য হবে, মরবে এবং প্রাণ দেবে। কিন্তু ... এর দ্বারা ফল কিছু হবে না। কারণ বিক্ষোভ, বিস্ফোরণ, স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন যত ব্যাপকতা নিয়েই গড়ে উঠুক, অসংগঠিত, রাজনৈতিক ভাবে অসচেতন জনতার শুধুমাত্র বিক্ষোভের রূপে এই আন্দোলন বেশিদূর পর্যন্ত এগোতে পারে না। ..."

তবে ফ্রান্সের গণবিক্ষোভ দেখাচ্ছে, পুঁজিবাদী শোষণে জর্জরিত মানুষ বিশ্বের সর্বত্রই পরিবর্তন চাইছে। বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের অপরিহার্যতা পদে পদে প্রমাণিত হচ্ছে।

'ওদের আক্রমণ যত বাড়বে আমাদের আন্দোলন তত জোরদার হবে'

একের পাতার পর

যাবে বুঝতে পেরে মারাত্মক সন্ত্রাস নামিয়ে আনে। ২২ নভেম্বর এস ইউ সি আই (সি) কর্মী কমরেড কবিতা পাত্রের উপর সিপিএম-তৃণমূল বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে মারাত্মকভাবে আহত করে। তাঁর উপর চরম নির্যাতন চালায় তারা। এর ৬ দিন বাদে আবার তাঁর ঘরে ঢুকে তাঁকে মারে দুষ্কৃতীরা। এই অবস্থায় সংগ্রামী মৈপীঠের মাটিতে দাঁড়িয়ে কমরেড কবিতা পাত্র যে অসীম সাহসী ভূমিকা নিয়েছেন তা আগামী দিনে বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মীদের প্রেরণা জোগাবে। এই উদ্দেশ্যে ৯ ডিসেম্বর মৈপীঠে শনিবারের বাজারে এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আয়োজিত সভায় কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি যা বলেছেন, তা প্রকাশ করা হল।

কমরেড কবিতা পাত্র

প্রশ্ন ঃ তৃণমূল-সিপিএম মিলে আপনার উপর আক্রমণ করেছে, কিন্তু কেন?

কবিতা পাত্র ঃ আমি এস ইউ সি আই (সি) কর্মী। তাই ওরা আমার উপর আক্রমণ করেছে। আমি সক্রিয় কর্মী, আমি দলের কাজ করি তাই ওরা আক্রমণ করেছে।

প্রশ্ন ঃ আবারও তো আক্রমণ করবে, তাও এই দলটা করবেন?

কবিতা পাত্র ঃ ওদের আক্রমণ চলবে আমরাও আন্দোলন করতেই থাকব। শিবদাস ঘোষের আদর্শ থেকে আমাদের কেউ টলাতে পারবে না।

প্রশ্ন ঃ আপনার তো ছেলে আছে, তাকে কী শেখাবেন?

কবিতা পাত্র ঃ ওকে শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা, পার্টির আদর্শ শেখাব, পার্টির ক্লাসে নিয়ে যাব। এভাবেই ওকে আমি সুন্দরভাবে গড়ে তুলব।

প্রশ্ন ঃ আর পশ্চিমবঙ্গে আপনাদের মতো যে মেয়েরা আছে তাদের কী বলবেন?

কবিতা পাত্র ঃ তাদের আমি একই কথা বলব। প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি মেয়েদের, মায়েদের, বোনেদের একই কথা বলব যে শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা নিয়ে সকলে এগিয়ে আসুন। বলব প্রতিবাদ কর, গরিব মানুষ এক হও।

প্রবীণ নেতা
কমরেড ভি এন সিং-এর জীবনাবসান

উত্তরপ্রদেশের এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পূর্বতন রাজ্য সম্পাদক কমরেড ভি এন সিং দীর্ঘ রোগভোগের পর ৪ ডিসেম্বর জৌনপুর জেলার বদলাপুরে নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। মৃত্যুসংবাদ পাওয়া মাত্র কানপুরে দলের রাজ্য দপ্তর সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও আঞ্চলিক অফিসে রক্তপতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। তাঁর মরদেহ পার্টি অফিসে আনা হলে রাজ্য সম্পাদক কমরেড পুষ্পেন্দ্র সহ রাজ্য কমিটির অন্যান্য সদস্যরা তাঁর প্রতি বৈপ্লবিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে তিনি বিহার রাজ্য কমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে বিহার রাজ্য অফিসেও রক্তপতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। প্রথম জীবনে তিনি রেলে চাকরি করতেন। সেই সময়ে তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যুক্ত থাকায় বিভিন্ন বাম রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের সংস্পর্শে আসেন। কিছুদিনের জন্য নকশালপন্থী রাজনীতির দ্বারাও প্রভাবিত হন। এই সময় তিনি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তাবিদ-দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষের নাম শোনেন। কলকাতায় এসে তিনি খুঁজে খুঁজে কমরেড শিবদাস ঘোষের সঙ্গে দেখা করেন।

১৯৬৯ সালে কলকাতায় প্রথম কমরেড শিবদাস ঘোষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। কমরেড শিবদাস ঘোষের সান্নিধ্যে এসে তাঁর জীবনের ধারা সম্পূর্ণ বদলে যায়। কমরেড শিবদাস ঘোষের পথ প্রদর্শন, স্নেহ, মমতার ভিত্তিতে তিনি ধীরে ধীরে কর্মী, সংগঠক এবং জননেতায় পরিণত হন। উত্তরপ্রদেশে পার্টির কাজের সূত্রপাত কমরেড ভি এন সিং-এর দ্বারাই হয়। লক্ষ্ণৌ, কানপুর, এলাহাবাদ সহ উত্তরপ্রদেশের ১৪টি জেলায় পার্টির কাজ ছড়িয়ে পড়ে। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষও কয়েকবার উত্তরপ্রদেশে যান। অসংখ্য কর্মীকে তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের কাছে নিয়ে আসতেন এবং তাঁরই নির্দেশানুসারে এঁদের গড়ে তোলার চেষ্টা করতেন। এমনকী রোগশয্যাতেও কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মৃতি তাঁর বুকে জীবন্ত ছিল, জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও কমরেড শিবদাস ঘোষের স্নেহস্পর্শের কথা বলতে বলতে তাঁর চোখে জল এসে যেত।

তিনি অদম্য সাহসী ছিলেন। অসংখ্য গণআন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। গরিব মানুষের উপর অত্যাচার হলে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তেন। আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য তিনি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ছুটে বেড়াতেন। তাঁর উদ্যোগ এবং আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানের জন্যই বিভিন্ন জেলায় পার্টি সংগঠন গড়ে ওঠে। বহু কর্মী-সংগঠক পার্টিতে যুক্ত হন। আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি কয়েকবার পুলিশের হাতে নিগৃহীত হন। বেশ কয়েকবার তাঁকে জেলেও যেতে হয়।

রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে বিহারে ডেহ্‌রি-অন-শোন-এ চাকরিরত অবস্থায় ঔরঙ্গাবাদ জেলাতেও তিনি পার্টি সংগঠন গড়ে তোলেন। তিনি শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি ছিলেন এবং কৃষক খেতমজদুর সংগঠন এ আই কে কে এম এসেরও সর্বভারতীয় নেতা ছিলেন।

কয়েকবছর আগে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। রাজ্য সম্পাদকের দায়িত্ব পালনে শারীরিক দিক থেকে সম্পূর্ণ অসমর্থ হয়ে পড়েন। তাঁর পরামর্শে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদনের ভিত্তিতে ২০১৭ সালে উত্তরপ্রদেশে পার্টির বিশেষ রাজ্য সম্মেলনে কমরেড পুষ্পেন্দ্রকে রাজ্য সম্পাদক নির্বাচিত করে নতুন রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিতেও তিনি সদস্য হিসাবে ছিলেন। যতদিন পেরেছেন, পার্টির পত্র-পত্রিকা নিয়মিত অধ্যয়ন করা, কর্মী-নেতাদের বিভিন্ন পরামর্শ দেওয়া, খবরাখবর রাখা ইত্যাদি করতেন। তাঁর মৃত্যুতে দলের অপরিসীম ক্ষতি হল। তাঁর বিপ্লবী জীবন সকল কর্মী সংগঠকদের কাছে এক অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

কমরেড ভি এন সিং লাল সেলাম

পরিযায়ী শ্রমিক না ক্রীতদাস

ল্যাঙ্কাশায়ারের পেঁয়াজ খেতে কাজ করছে রোমের শ্রমিকেরা। সৌদি আরবে বড় বড় বিলাসবহুল হোটেল নির্মাণের কাজ করছে ভারতের শ্রমিকেরা। চিনের শ্রমিকেরা ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত নানা দেশের কারখানায় চপ্পল বানাচ্ছে। ক্যালিফোর্নিয়ার টম্যাটো খেতে কাজ করছে মেক্সিকো থেকে আসা শ্রমিকেরা। এরকমই গোটা দুনিয়ার গরিব-মধ্যবিত্ত ঘরের লাখ লাখ পুরুষ এবং মহিলা নিজেদের ঘর-পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সব ছেড়ে দূর-দুরান্তে চলে যায় জীবন-জীবিকার তাগিদে। কখনও দেশের মধ্যেই এক রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যে, কখনও একেবারে অজানা-অচেনা দেশে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে এই ধরনের শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ২০০ মিলিয়ন বা ২০ কোটি। অর্থনীতির ভাষায় এঁরা মাইগ্র্যান্ট লেবার বা পরিযায়ী শ্রমিক।

ইদানীং খবরের কাগজে মাঝেমধ্যেই এঁদের সম্পর্কে নানা খবর বেরোচ্ছে। সে খবরগুলো বড় নির্মম, বড় ভয়ঙ্কর। প্রকাশিত তথ্যে জানা যাচ্ছে, গত পাঁচ-ছয় বছরে প্রায় ৩০ হাজার ভারতীয় শ্রমিকের অকালমৃত্যু ঘটেছে ইউরোপ-আমেরিকা-আরব সহ বিভিন্ন দেশে কাজ করতে গিয়ে। কেন তাঁদের এমন মর্মান্তিক পরিণতি? ২০১২ সালের ডিসেম্বরে দু-বছরের চুক্তির ভিত্তিতে সৌদি আরবে গিয়েছিল ঋতেশ শর্মা। কোনও ভাবে ফিরে এসে সে জানিয়েছে, "আমি ওয়েল্ডিং-এর কাজ করার জন্য গিয়েছিলাম। কিন্তু পৌঁছানো মাত্র তারা আমার পাসপোর্ট কেড়ে নিল এবং নির্মাণ শ্রমিক হিসাবে কাজে লাগালো। একবার বাড়িতে ফোন করার চেষ্টা করাতে আমার ফোনটাও কেড়ে দিন পনেরো রেখে দিয়েছিল।" সৌদি আরব মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। সেই জন্যই কি ঋতেশের উপর এই অত্যাচার? হিন্দুত্ববাদী আরএসএস-বিজেপির তোলা এই ধরনের অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়ে মহম্মদ ইউসুফের অভিজ্ঞতা বলছে, না, তা নয়। শ্রম লুঠ করার ষড়যন্ত্রে জাত-ধর্মের কোনও ফারাক নেই।

এক এজেন্ট ইউসুফকে বলেছিল, তাঁকে সেলস্-এর কাজ দেওয়া হবে। কিন্তু পৌঁছানোর পর তাঁর অভিজ্ঞতাও প্রায় ঋতেশেরই মতো। তাঁকেও নির্মাণ শ্রমিকের কাজে লাগানো হয়। আসিমা খাতুন নামের এক তরুণী গিয়েছিল রিয়াধ-এ। এজেন্ট বলেছিল, খুব ভাল কাজ, অনেক টাকা মাইনে। মাস পাঁচেক পর আসিমার মৃত্যুসংবাদ পেল তাঁর পরিবার। মুম্বইয়ের তরুণী সানা সৌদিতে গিয়েছিল ২০১৫ সালের অক্টোবরে। এজেন্ট তাঁর গোষ্ঠীরই লোক। কথা ছিল, সানা কাজ করবে একজন হাউজ নার্স হিসাবে। বাড়ির মালিক বলেছিল সে সানাকে নিজের মেয়ের মতোই রাখবে। কিন্তু কিছু দিন পরেই আসল চেহারা প্রকাশ পায়। সানাকে বাধ্য করা হয় অন্যান্য সমস্ত কাজে। এমনকী তাকে ঠিক মতো খেতে পর্যন্ত দেওয়া হত না। কোনও রকমে সে পালিয়ে দেশে ফিরেছে। সানার মা জানায়, "ও তখন ফোন করে খালি কাঁদতো। আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম। সুষমা স্বরাজকেও চিঠি লিখেছিলাম। কেউ কেউ বলেছিল, মোদিজিকে চিঠি লেখ। আমি সরকারি দপ্তরে গিয়েছি কিন্তু কেউ কোনও জবাব দেয়নি।"

এরকম অসংখ্য ঘটনা প্রতিদিন ঘটে চলেছে। জীবন-জীবিকার তাগিদে, কাজের খোঁজে কত কোটি কোটি মানুষের জীবন যে প্রতিদিন তছনছ হয়ে যাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। এই কঠোর বাস্তবের সাথে বিভিন্ন শাসক দলের মন্ত্রী-নেতাদের 'উন্নয়নী বক্তৃতা' আদৌ মেলে কি? তাঁরা প্রতিদিনই বলছেন, কোটি কোটি টাকা নাকি বিনিয়োগ হচ্ছে, দেশ নাকি এগোচ্ছে। কাগজে-কলমে অনেক তথ্য-পরিসংখ্যানও তাঁরা দেন, সে-সব নিয়ে রেডিও-টিভি-কাগজে প্রতিদিন কত বিজ্ঞাপন! এগুলো যদি সত্যি হয় তা হলে দেশের কোটি কোটি তরুণ-তরুণী যা-হোক একটা কাজের খোঁজে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভিনদেশ-ভিনরাজ্যে যায় কেন?

এক সময় জাহাজে বোঝাই করে দূর-দুরান্তের নানা কর্মক্ষেত্রে দাসদের নিয়ে যেত মালিকরা। এখন হয়েছে বিভিন্ন এজেন্সি, যেগুলো চলে মূলত শাসক দলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে। বিদেশে ভাল কাজ পাইয়ে দেওয়ার কথা বলে এই এজেন্সিগুলো বেকারদের নিশানা করে। ভারতে কোটি কোটি বেকার। ফলে এদেশে এইসব এজেন্সিগুলোর রমরমা ব্যবসা চলছে। গোটা বিশ্বে যত পরিযায়ী শ্রমিক আছে তার মধ্যে ভারতীয় শ্রমিকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তা হলে কি ভারতের বাইরে, ইউরোপ-আমেরিকা-আরব সহ উপসাগরীয় দেশগুলোতে অনেক কাজের সুযোগ আছে? ঘটনা আদৌ তা নয় এবং ঠিক এইখানেই পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে পরিযায়ী শ্রমিকের প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ।

গত প্রায় কুড়ি বছরে ইউরোপ, আমেরিকার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে। কল-কারখানা বন্ধ হচ্ছে। সেখানকার জনজীবনে তার প্রভাব পড়ছে ব্যাপক। মানুষ কাজ হারাচ্ছে, জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ইত্যাদি পরিষেবা ক্ষেত্র থেকে মধ্যবিত্তেরাও বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে, স্বাভাবিক কারণেই লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-মিছিল-বিক্ষোভে সামিল হচ্ছে, ধর্মঘট করছে। আন্দোলন দমন করতে আসা পুলিশ-সেনাবাহিনীর সাথে তারা মুখোমুখি সংঘর্ষেও যাচ্ছে। তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রের কর্মীরা আউটসোর্সিং (অফিসিয়াল কাজ অন-লাইনে অন্য দেশ থেকে সস্তায় করিয়ে আনা)-এর বিরুদ্ধে স্লোগান তুলছে। উপসাগরীয় দেশগুলোতেও গরিব, গৃহহীন, বেকারের হার ক্রমশ বাড়ছে। ২০০৩ সালে মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে ছিল। বর্তমানে তা আরও বেড়েছে।

এই মরণোন্মুখ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য সর্বত্রই মালিকশ্রেণি পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজে লাগাচ্ছে। কারণ, এদের কাজে লাগাবার ক্ষেত্রে মালিকেরা অনেক সুবিধা পায়। যেহেতু এরা বহু দূর থেকে ঘর-বাড়ি ছেড়ে আসে এবং অনেক সময়ই আইনি কাগজপত্র ঠিকঠাক থাকে না ফলে এদের মধ্যে অসহায়তা থাকে ভীষণ ভাবে। অচেনা-অজানা জায়গায় গিয়ে ঠিকঠাক কাজ বা মাইনে না পেলেও দ্রুত এদের কিছু করার থাকে না। এদের কোনও সংগঠন করার উপায় নেই, যার মাধ্যমে তারা বিপদ-আপদ বা অন্যান্য সমস্যা থেকে উদ্ধার পেতে পারে। অনেকটা বন্দি দাসের মতো হয়ে পড়ে এরা। ফলে মালিকেরা যেমন খুশি এদের ব্যবহার করে। মাইনের পুরো টাকা হাতে দেয় না। পাসপোর্ট আটক করে রাখে। বাসস্থান, স্বাস্থ্য বা অন্য কোনও দিকে নজর দেয় না। এক কথায়, যখনই দরকার পড়ে, অত্যন্ত কম টাকায় ইচ্ছেমতো খাটিয়ে নিচ্ছে এই শ্রমিকদের। আর, শ্রম লুঠ করা এই মালিকদের টাকায় গদিতে বসা সরকারগুলোও এসব চলতে দিচ্ছে নিজেদের কায়েমি স্বার্থে।

শাইনিং ইন্ডিয়ার উল্লাসে চাপা পড়ছে সাফারিং ইন্ডিয়ার কান্না

ভারতে দৈনিক সাত হাজার মানুষ অনাহারে মারা যাচ্ছে। প্রতি ঘণ্টায় আত্মহত্যা করছে ৫ জন কৃষক। প্রতিদিন ১২০ জন শ্রমিক আত্মহত্যা করছে। দৈনিক ৩০ টাকা রোজগার করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে খেটে খাওয়া মানুষকে।

উল্টোদিকে, 'বার্কলে হুরুন ইন্ডিয়া'র করা এক সমীক্ষায় ২০১৮ সালের ধনীদের আয়ের খতিয়ানে উঠে এসেছে, ধনকুবের মুকেশ আম্বানির দৈনিক আয় ৩০০ কোটি টাকা। জানা গেছে, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানির মোট সম্পত্তির পরিমাণ বর্তমানে ৩ লক্ষ ৭১ হাজার কোটি টাকা। আর দেশের প্রথম সারির তিন শিল্পপতি এস পি হিন্দুজা অ্যান্ড ফ্যামিলি, এল এন মিত্তল অ্যান্ড ফ্যামিলি এবং আজিম প্রেমজির বার্ষিক আয় যথাক্রমে ১ লাখ ৫৯ হাজার কোটি টাকা, ১ লাখ ১৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা, ৯৬ হাজার ১০০ কোটি।

'ওয়ার্ল্ড ইনইকুয়ালিটি রিপোর্ট'-এ সম্প্রতি উঠে এসেছে, ভারতে ধনী-গরিবের বৈষম্য চূড়ান্ত। শাসক শ্রেণির ভূমিকা এই বৈষম্যকে বাড়াতে সাহায্য করছে। 'গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স ২০১৮'র রিপোর্ট ভারতের ভুখা পেটের ছবি তুলে ধরেছে। বিশ্বের ১১৯টি দেশকে নিয়ে করা এই সমীক্ষায় ভারতের স্থান ১০৩ নম্বরে অর্থাৎ ভুখা ভারত পিছনের দিক থেকে রয়েছে এগিয়ে।

ভারতে কংগ্রেসি শাসনে মানুষের দুরবস্থা ছিল মারাত্মক। তাকে নির্বাচনী প্রচারের হাতিয়ার করে ও উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপি ক্ষমতাসীন হয়েছে। বর্তমানে বিজেপি শাসনে মাত্র সাড়ে চার বছরে মূল্যবৃদ্ধি চলে গেছে নিয়ন্ত্রণের বাইরে, ডিজেল-পেট্রল-রান্নার গ্যাসের দাম বেড়েই চলেছে। কালো টাকা ফেরানোর নামে ধনকুবেরদের সম্পদকে আরও সংহত করা হয়েছে। নোট বাতিল সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। সরকারের সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে ধনকুবেরদের মুনাফা আরও বাড়ানোর উদ্দেশ্যে।

এ রাজ্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসও সাধারণ মানুষের জীবনের চাহিদা মেটাতে পারছে না। ক্ষুব্ধ জনগণ যাতে সরকারবিরোধী না হয় তাই ভোটে বাজিমাত করে গদি রক্ষার উদ্দেশ্যে মানুষকে দাননির্ভর অর্থাৎ 'ডোল'-নির্ভর করছে এবং যুব সমাজকে অনৈতিক জীবনে ঠেলে দিচ্ছে। সিপিএম সরকারের আমলেও একই কৌশল নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হত, তারই পুনরাবৃত্তি চলছে বর্তমানে। স্বাভাবিকভাবেই এই দলগুলির নেতারা ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য নিয়ে একটা কথাও উচ্চারণ করে না। বরং তারা কত 'উন্নয়ন' করেছে তারই ফিরিস্তি দিতে থাকে। ফলে ভুখা মানুষের দুঃখ-ব্যথা চাপা পড়ে যাচ্ছে ধনকুবেরদের জাঁকজমকের আড়ালে।

২১ এবং ২৬ ডিসেম্বর ব্যাঙ্ক ধর্মঘট

ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বেতন সংশোধন, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের সংযুক্তিকরণের বিরুদ্ধে ২১ ডিসেম্বর ব্যাঙ্কের অফিসারদের সংগঠন এআইবিওসি এবং ২৬ ডিসেম্বর ব্যাঙ্কের ৯টি সংগঠনের যুক্ত মোর্চা ইউএফবিইউ ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম এই ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়েছে।

এআইবিইইউএফের সাধারণ সম্পাদক কমরেড জগন্নাথ রায়মণ্ডল বলেন, বৃহৎ পুঁজিপতিরা ব্যাঙ্ক থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ নিয়ে শোধ করছে না। এনপিএ ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে ব্যাঙ্কগুলি দুর্বল হয়ে পড়েছে। নরসিংহম কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সে কারণেই ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের এ হেন পদক্ষেপ। এই সংযুক্তিকরণ ব্যাঙ্কশিল্পে কর্মীসংকোচন ঘটাবে।

এর বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলনের আহ্বান জানিয়েছেন।

চাকরি কোথায় হল

একের পাতার পর

নীতি চলছে। এই অবস্থায় বেকারত্ব কমার তথ্য কোথায় পেলেন মুখ্যমন্ত্রী?

যেদিন এই খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, সেদিনই অপর একটি সংবাদ ওই একই পত্রিকায় ছাপা হয়। তাতে দেখা যাচ্ছে, রাজ্যে অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পারের ৬৫৪টি পদের জন্য লিখিত পরীক্ষায় বসেছেন ২০ হাজার যুবতী। ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশের এই কাজের জন্য আবেদন যাঁরা করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন বহু এম এ পাশ তরুণী।

কত টাকা বেতনের এই চাকরি? বেতন নেই। ভাতা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মিলে দেয় ৪,৮০০ টাকা। ইতিপূর্বে রাজ্যে ডোমের চাকরির জন্য, সাফাইকর্মীর জন্য এমএ, এমএসসি, এমটেক পাশ যুবকদের আবেদন করার খবরও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এ সমস্ত অন্যান্য রাজ্যের মতো এ রাজ্যের ভয়াবহ বেকার চিত্রকেই তুলে ধরে।

মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য তেলেভাজা, মোট বওয়াকেও শিল্প বলেন। চায়ের দোকানে কাজ করা, রিক্সা চালানো, ঠেলা চালানো, সব্জি বিক্রি এসব করেও একটা বিরাট অংশের মানুষ কোনওক্রমে প্রাণধারণ করে আছেন। এগুলি তো স্বনিযুক্ত কাজ। এ ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা কী? সরকার তো বেকার সমস্যা সমাধানের একটা রোডম্যাপ দেশের বেকারদের সামনে রাখবে। সেটা কোথায়?

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গত লোকসভা ভোটের আগে বছরে ২ কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারেননি। বাস্তবে মোদির শাসনে যতজন কাজ পেয়েছেন, কাজ হারিয়েছেন তার থেকে অনেক বেশি। এটাই অবক্ষয়িত পুঁজিবাদের পরিণাম। শিল্পায়ন এ যুগে সম্ভব নয়। কোনও রাজ্যে হচ্ছেও না। এদিন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী ৪০ শতাংশ বেকার কমার ফাঁপা বাণী শুনিয়ে আগামী দু'বছরে ১২ লক্ষ ছেলেমেয়ের চাকরির আশা শুনিয়েছেন।

এর পরই কলকাতায় কর্মমেলা ঘোষণা করে রাজ্য সরকার। প্রচার হতে থাকে সেই মেলায় এলেই হাতে হাতে চাকরি জুটবে। হাজার হাজার যুবক মেলায় আসার প্রস্তুতি নিচ্ছেন— এ খবর পেয়েই সরকার তৎক্ষণাৎ কর্মমেলা বাতিল করে দেয়।

আসলে 'মেলা'র নামে বেকার যুবক-যুবতীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি 'খেলা' চলছে।

৬-১২ ডিসেম্বর সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সপ্তাহ উদযাপনে ট্যাবলো, ধিক্কার মিছিল

▲ *পূর্ব মেদিনীপুরে সুসজ্জিত ট্যাবলো নিয়ে মিছিল*

➤ *বিহারের পাটনায় সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মিছিল*

➤ *সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সম্প্রীতির লক্ষ্যে সাইকেল মিছিল, মধ্য কলকাতা*

▲ *খাতড়া, বাঁকুড়ায় সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মিছিল*

রাজস্থানে ক্ষুদিরাম স্মরণ এ আই ডি ওয়াই ও-র

৩ ডিসেম্বর, শহিদ ক্ষুদিরামের ১৩০ তম জন্মদিবস উদযাপন করে এআইডিওয়াইও ঝুনঝুনু ইউনিট। এদিন পিলানির বাল্মিক বস্তিতে ক্ষুদিরাম স্মরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তি বিশ্বনাথ লোহারা। জেলা ইনচার্জ কমরেড বিষ্ণু ভার্মা, অফিস সম্পাদক কমরেড সুনীল কুমার এবং কমরেড দীপক দাহিয়া বক্তব্য রাখেন। শিশু-কিশোররাও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

ত্রিপুরায় ক্ষুদিরাম স্মরণ

ঘাটশিলায় শহিদ স্মরণ

ক্ষুদিরাম বসু স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে ৩ ডিসেম্বর সকালে আগরতলায় শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর পূর্ণাবয়ব মূর্তির পাদদেশে এক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন কমিটির সভাপতি সুভাষকান্তি দাস, সম্পাদক হরকিশোর ভৌমিক, ডঃ প্রণব বর্ধন, ডঃ অলক শতপথী, কমল রায়চৌধুরী সহ বিশিষ্ট জনেরা।

শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর বিপ্লবী জীবনের শিক্ষা তরুণ প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে ডি এস ও, ডি ওয়াই ও এবং এম এস এস পক্ষকালব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এদিন তারা আগরতলার পোস্ট অফিস চৌমূহনিতে বেদি স্থাপন করে মাল্যদান এবং ক্ষুদিরামের স্মারক ব্যাজ পরিধান কর্মসূচি পালন করে।

➤ *ঘাটশিলায় কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মৃতি উদ্যানে স্থাপিত শহিদ ক্ষুদিরামের মূর্তিতে ৩ ডিসেম্বর তাঁর জন্মদিবসে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড শিলাজিৎ সান্যাল*

মেডিকেল কলেজে বিজ্ঞান বাদ দিয়ে আধ্যাত্মিকতার চর্চা। প্রতিবাদে ডিএসও

আর জি কর মেডিকেল কলেজ এবং ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ একটি সার্কুলার দিয়ে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-চিকিৎসক, হাউস স্টাফ, নার্স সহ সকলকে ১৫ ও ১৭ ডিসেম্বর এক আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানে যোগদান করতে বলেছেন। এই অনুষ্ঠানের আয়োজক কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতি। অনুষ্ঠানের নাম— প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারীর ইন্টার‍্যাক্টিভ আধ্যাত্মিক সভা।

এর নিন্দা করে ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ ৮ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, "মেডিকেল কলেজের মতো শিক্ষায়তনে এই ধরনের আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান করাকে আমরা তীব্র ধিক্কার জানাই। একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক দেশে ধর্মীয় বিশ্বাস নাগরিকের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয় হিসাবে গণ্য হয়।

কোনও মেডিকেল কলেজে বিজ্ঞানের চর্চা ব্যতিরেকে এই সমস্ত আধ্যাত্মিকতার চর্চা ধর্মান্ধ, যুক্তিহীন, অবৈজ্ঞানিক মানসিকতা গড়ে উঠতেই সাহায্য করবে যা চিকিৎসাবিজ্ঞানকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। অবিলম্বে ওই অনুষ্ঠান বাতিল করে প্রয়োজনে দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানীদের নিয়ে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সেমিনার করা উচিত বলে আমরা মনে করি।"

রেল পরিষেবার দাবিতে কোচবিহারে বিক্ষোভ

এস ইউ সি আই (সি) কোচবিহার শহর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে ২২ নভেম্বর কোচবিহার স্টেশনে রেল-এর বিভিন্ন পরিষেবা আদায়ের দাবিতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বামনহাট-শিলিগুড়ি জংশন ডেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেন চালু, উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস ও পদাতিক সুপারফাস্ট ট্রেনে জেনারেল কোচের সংখ্যা বৃদ্ধি, রেলওয়ে সার্ভিসের বৈদ্যুতিকরণ এবং ডবল লাইন চালু, চলন্ত সিঁড়ি ও র‍্যাম্প চালু সহ বিভিন্ন দাবিতে এই কর্মসূচি পালিত হয়। স্বাক্ষর সংবলিত দাবিপত্র আলিপুরদুয়ার জংশনের ডিআরএম-এর নিকট জমা দেওয়া হবে। এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন এস ইউ সি আই (সি) কোচবিহার জেলা কমিটির সদস্য কমরেড প্রভাত রায়।

ওড়িশায় এনএমসি-র বিরুদ্ধে সেমিনার

ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমান মেডিকেল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় মারাত্মক আঘাত হানতে চলেছে। এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার সহ ডাক্তারদের বিভিন্ন সংগঠন। ১১ নভেম্বর ওড়িশার কটকে এসসিবি ডেন্টাল কলেজে এমএসসি-র উদ্যোগে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

মেডিকেল ছাত্র, নার্স, ফার্মাসিস্ট, চিকিৎসকদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন ডাঃ সুরজিৎ সাহু। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক রত্নাকর পাণ্ডা, ডাঃ মনোরঞ্জন মহাকুর, অল বেঙ্গল অ্যান্টি এন এম সি কমিটির কনভেনর ডাঃ কবিউল হক, এমএসসি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অংশুমান মিত্র।

রথযাত্রার পাল্টা পবিত্রযাত্রা

একের পাতার পর

দায়ী। এখানে অনুপ্রবেশকারী বলতে তাঁরা বোঝাচ্ছেন মুসলমান ধর্মাবলম্বী মানুষদের। উদয়াস্ত কঠোর পরিশ্রম করে দুবেলা দুমুঠো পেটের ভাত জোগাড় করতে ব্যস্ত বেশির ভাগ মানুষ খবর রাখেন না তাঁদের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির জন্য দায়ী আসলে

সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সপ্তাহ উদযাপনে শিলিগুড়িতে মিছিল

কারা? তাঁরা ধরতেই পারেন না, ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক, শোষণমূলক এই পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থাই প্রতি মুহূর্তে তাঁর জীবনের সমস্যাগুলির জন্ম দিচ্ছে। মানুষের এই অসচেতনতাই বিজেপির পুঁজি। কংগ্রেসের মতোই বিজেপিও দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণির আরেক প্রধান বিশ্বস্ত

ক্যানিংয়ের সাতমুখী বাজারে সভা

দল। তার কাজই হল, এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোষণমূলক চরিত্রটিকে সাধারণ মানুষের চোখ থেকে আড়াল করা। না হলে যে বিজেপি নেতারা এ রাজ্যের মানুষকে অহরহ বোঝাচ্ছেন, রাজ্যের ভয়াবহ বেকারির জন্য অনুপ্রবেশকারীরা দায়ী, তাঁদের তো উত্তর দিতে হবে, বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশে কিছুদিন আগে ২৬৮টি পিয়ন পদের জন্য যে ২৩ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতী আবেদন করেছেন, যাঁদের মধ্যে হাজার হাজার মাস্টার ডিগ্রিধারী, ইঞ্জিনিয়ার, পিএইচডি ডিগ্রিধারী রয়েছেন, সেই ভয়াবহ বেকারত্বের জন্য কে দায়ী? দায়ী কি অনুপ্রবেশ? আসলে অনুপ্রবেশ বিষয়টাও তাদের মাথাব্যথার কারণ নয়। কেন্দ্রে বিজেপি শাসন। তা হলে তাঁরা প্রথমেই বলতেন, সীমান্ত দিয়ে কোনও অনুপ্রবেশ যাতে না হতে পারে তার জন্য আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। তা তাঁরা একবারও বলছেন না। আসামে এনআরসিতে যে ৪০ লক্ষ ভারতীয়ের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা সকলে অনুপ্রবেশকারী দূরের কথা এমনকী মুসলমানও নন। বিরাট সংখ্যায় রয়েছেন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অসমীয় এবং বাঙালিরা। অন্য প্রদেশের বাসিন্দারাও রয়েছেন। অনুপ্রবেশের ধুয়ো তুলে বিজেপি গুজরাট থেকে বাঙালি শ্রমিকদের তাড়াচ্ছে, অন্য দিকে বিহারী শ্রমিকদের তাড়াচ্ছে গুজরাটি সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়ে। আবার মহারাষ্ট্র থেকে একইভাবে বাঙালি শ্রমিকদের তাড়াচ্ছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বলে।

বিজেপির আসল লক্ষ্য সাধারণ মানুষের মধ্যে জাত ধর্ম বর্ণ আঞ্চলিকতা প্রাদেশিকতাকে কেন্দ্র করে অন্ধ উন্মাদনা জাগিয়ে ভোট ব্যাঙ্ক তৈরি করা এবং একে কাজে লাগিয়ে গদির দখল নেওয়া। বাস্তবে ধর্ম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের যে আবেগকে কাজে লাগাচ্ছেন বিজেপি নেতারা, সেই আবেগের চিহ্নমাত্র নেই তাঁদের নিজেদের মধ্যে। তাঁরা ধার্মিক নন, ধর্ম ব্যবসায়ী। ধর্মকে পুঁজি করে তাঁরা একদিকে ক্ষমতার দখল নিতে চান, অন্য দিকে পুঁজিবাদী শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ থেকে পুঁজিপতি শ্রেণিকে আড়াল করতে চান।

গণতান্ত্রিক চেতনার ছিটেফোঁটাও এই নেতাদের মধ্যে নেই। বিজেপি নেতারা বক্তৃতায় যে ভাষা ব্যবহার করে চলেছেন, সর্বভারতীয় সভাপতি থেকে এ রাজ্যের সভাপতির মুখে 'তাড়িয়ে দেব, লাথি মারব, মেরে ফেলব' ছাড়া যে অন্য ভাষা নেই, সেগুলিই তার স্পষ্ট প্রমাণ। এঁরা নাকি গণতান্ত্রিক, এঁরা দেবেন রাজ্যের মানুষকে গণতন্ত্র!

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্য, যার একটা বিরাট গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য রয়েছে, নবজাগরণ আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন, বামপন্থী আন্দোলনে উজ্জ্বল যার ইতিহাস, সেখানে বিজেপির মতো একটি সাম্প্রদায়িক, অগণতান্ত্রিক, পুঁজিপতি শ্রেণির বিশ্বস্ত দল হম্বিতম্বি করতে পারছে কী করে? বাস্তবে এর পিছনে রয়েছে সিপিএম এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সংকীর্ণ ভোটবাজ রাজনীতি।

সিপিএম নেতারা সাম্প্রদায়িকতার এমন বিরোধী যে, সেই লড়াইয়ে কংগ্রেসকেও জাপটে ধরে সঙ্গে নিয়েছেন। তাঁদের নিজেদের ৩৪ বছরের শাসনের ইতিহাস কী? সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দলের মধ্যে বা জনগণের মধ্যে আদর্শগত কোনও চর্চাই এই দলের নেতারা করেননি। ধর্মনিরপেক্ষতা কী, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার পরিচালনায় গণতান্ত্রিক রীতিনীতি কী, সেকুলারিজমের চিন্তা কেন ধর্মীয় তথা সামন্ততান্ত্রিক চিন্তার থেকে শ্রেষ্ঠ, এ সবের কোনও চর্চাই তাঁরা করেননি। শুধু তাই নয়, সরকার পরিচালনায়, দল পরিচালনায়, ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরা সর্বত্র এগুলি লঙ্ঘন করেছেন। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দেওয়ার নামে তাঁরা তাদের ভোটব্যাঙ্ক হিসাবে ব্যবহার করেছেন। নির্বাচনে হিন্দু এলাকায় হিন্দু প্রার্থী, মুসলমান এলাকায় মুসলমান প্রার্থী দেওয়া তাঁরা রেওয়াজে পরিণত করেছিলেন। সিপিএমের পূর্বসূরি সিপিআই দ্বিজাতি তত্ত্ব তথা ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনকে সমর্থন করেছিল। অর্থাৎ আদর্শগত ভাবে সাম্প্রদায়িকতার মোকাবিলার কোনও চেষ্টা এই দলটি করেনি এবং আজও করছে না। এ সব চর্চার পরিবর্তে কোনও রকম গণতান্ত্রিক রীতিনীতির তোয়াক্কা না করে যেভাবে হোক দলের ভোট বাড়ানোর দিকেই ছিল তাদের মূল নজর। কখনও গোপনে, কখনও নানা বুকনির আড়ালে এই সাম্প্রদায়িক চর্চার জন্যই আজ তাদের দলের কর্মী সমর্থকদের, নিচের তলার নেতাদের এমনকী এমএলএ, এমপি-দেরও দলে দলে বিজেপিতে যোগ দিতে কোথাও আটকাচ্ছে না। আজও সাম্প্রদায়িকতা রোখার নামে সিপিএমের নেতারা যে কংগ্রেস শিবিরের পিছনে ঘুরঘুর করছেন, তারও মূল লক্ষ্য কংগ্রেস শিবির সরকার গঠন করলে ক্ষমতার ছিটেফোঁটা যদি তাদেরও জোটে। অথচ এই কংগ্রেসের ইতিহাস অসংখ্য দাঙ্গার রক্তে রঞ্জিত। ১৯৮৬ সালে বাবরি মসজিদের তালা খুলে দিয়ে কংগ্রেসই রামমন্দির-রাজনীতির সূচনা করেছিল। আজও কংগ্রেস নেতা হিসাবে রাহুল গান্ধী বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের দ্বারা মোকাবিলা করার পরিবর্তে 'আমিও কম বড় হিন্দু নই' প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। নরেন্দ্র মোদির সাথে মন্দিরে যাওয়ার প্রতিযোগিতা করে যাচ্ছেন। বলছেন, কংগ্রেস মন্দির নির্মাণের বিরোধী নয়। মধ্যপ্রদেশ নির্বাচনের ইস্তাহারে কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, প্রতি পঞ্চায়েতে গোশালা তৈরি করবে, গো-মূত্র বিক্রি করবে এবং রামের বনে যাওয়ার পথ তৈরি করে দেবে। রাজস্থানের নির্বাচনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, বৈদিক নীতিকথা পড়ানোর জন্য পৃথক শিক্ষাবোর্ড গঠন করবে। এই কংগ্রেসকেই সিপিএম নেতারা বিজেপির সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সেনাপতি করেছেন! কংগ্রেস তার দীর্ঘ শাসনে অসংখ্য জনবিরোধী কালা আইন তৈরি করেছে। জরুরি অবস্থা জারি করে সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে, একের পর এক নির্বাচিত সরকারকে ফেলে দিয়েছে।

কলকাতার হাজরায় সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী স্মারক

এই কংগ্রেসকেই আজ সিপিএম নেতারা বড় গণতান্ত্রিক বলে ঠাউরেছেন!

তৃণমূল নেত্রী হুঙ্কার ছাড়ছেন, সাম্প্রদায়িক

শিয়ালদহে সভায় বক্তব্য রাখছেন দলের রাজ্য সম্পাদক

বিজেপির স্থান এই রাজ্যে হবে না। অথচ তৃণমূলের কার্যকলাপই বিজেপিকে এই রাজ্যে বাড়তে সাহায্য করছে। কারণ তৃণমূলও বিজেপির সাম্প্রদায়িকতার মোকাবিলার পরিবর্তে তাদের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। বিজেপি রামনবমী উপলক্ষে একটা মিছিল করলে তৃণমূল তিনটে মিছিল করছে। হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে বিজেপি হনুমানের একটা মূর্তি স্থাপন করলে তৃণমূল কয়েক গুণ লম্বা দশটা মূর্তি বসাচ্ছে। গণেশ পুজোর প্রতিযোগিতায় তাদের লক্ষ্য বিজেপিকে টেক্কা দেওয়া। অথচ এগুলির কোনওটিরই বাংলার রাজনীতিতে কোনও স্থান ছিল না। এমনকী জনমানসেও এগুলির তেমন প্রভাব ছিল না। বিজেপির রথযাত্রার পাল্টা তৃণমূল পবিত্রযাত্রা করছে। দলের এক নেতা চার হাজার খোল এবং আরও কয়েক হাজার খঞ্জনি বিতরণ করছেন। এসবই জনমানসে ধর্মীয় মানসিকতাকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। যাকে ব্যবহার করেই বিজেপি আসর মাতাচ্ছে। আবার এই তৃণমূল সরকার সংখ্যালঘু ভোট নিশ্চিত করতে নানা ভাবে তাদের সন্তুষ্ট করতে চেয়েছে, যা নানা ভাবে সংখ্যাগুরু মানুষদের মধ্যে প্রশ্ন তুলতে সাহায্য করেছে। অথচ প্রয়োজন ছিল এ রাজ্য নবজাগরণ, স্বাধীনতা আন্দোলন ও বামপন্থী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে গণতান্ত্রিক চেতনা এবং গুণাবলি অর্জন করেছিল, যা সামন্তী চিন্তা, পশ্চাৎপদতা, কূপমণ্ডুকতা থেকে মানুষকে মুক্ত করে আধুনিক চিন্তায় সমৃদ্ধ করেছিল, সেগুলির বিস্তৃত চর্চার মধ্য দিয়ে সেগুলিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সমাজের একেবারে নিচের তলা পর্যন্ত যুক্তির চর্চা, বৈজ্ঞানিক মনন গড়ে তোলার পরিবেশ তৈরি করা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতি এবং পদক্ষেপগুলির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক দাবিগুলিকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে মানুষকে টেনে নিয়ে আসা। কিন্তু সে পথে তাঁরা গেলেন না। পরিবর্তে তৃণমূল নেত্রী বিরোধী জোট গঠন করে ভোটে বিজেপিকে হঠানোর মতলব করেছেন। যেন এই সরকারকে সরিয়ে দিলেই জনগণের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, সাম্প্রদায়িকতাকে পরাস্ত করা যাবে। ভোটসর্বস্ব বিরোধী দলগুলি নীতিতে প্রায় কেউই বিজেপি সরকারের থেকে আলাদা নয়। প্রত্যেকেই যে যেখানে ক্ষমতায় রয়েছে কিংবা থেকেছে তারা সকলেই দেশীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে কাজ করছে এবং ভোটে জিততে সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করছে।

এই অবস্থায় জনগণের সামনে একটিই বিকল্প রয়েছে। আবার কোনও বিরোধী দলের জোটে ফেঁসে না গিয়ে পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে এবং তার অনুসারী নীতিগুলির বিরুদ্ধে গণ ঐক্য গঠন করে শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলা। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) মহান মার্কসবাদ লেনিনবাদ কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে সর্বতোভাবে সেই প্রচেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছে।

পাঠকের মতামত

এই নাকি উন্নয়ন !

কংগ্রেসের মতোই বিজেপি সরকারও উন্নয়ন ও অগ্রগতি দেখাতে জিডিপি-র হার বৃদ্ধিকেই হাতিয়ার করছে। যদিও এই হার বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন যে ছিঁটেফোঁটাও হয় না তা আজ প্রমাণিত। এতে উন্নয়ন হয় এক শতাংশ মালিকদের— ধনীদের, আর ৯৯ শতাংশ মানুষ আরও দুঃস্থ হয়ে পড়ে। এ নিয়েও বিতর্কের কোনও অবকাশ নেই।

সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘ প্রকাশিত 'দি স্টেট অফ ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড নিউট্রিশন ইন দি ওয়ার্ল্ড ২০১৮'- তে দেখা যাচ্ছে, বিশ্বে গত তিন বছরে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮২ কোটি ১০ লক্ষ। রিপোর্ট বলছে, প্রতি নয় জন মানুষের মধ্যে একজন ক্ষুধা নিয়ে দিন কাটাচ্ছে। বিশ্বের ক্ষুধার্ত মানুষের এই হারের পাশে আর্থিক অগ্রগতিতে অন্য দেশগুলিকে টেক্কা দেওয়া ভারতে প্রতি পাঁচজনে একজন ক্ষিদেয় চুপসে যাওয়া পেট নিয়ে ঘুমাতে যায়। ভারতই হল বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ক্ষুধার্ত মানুষের দেশ। সরকার পরিবর্তন হলেও এই অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয় না। তাই দেখা যাচ্ছে ভারতে বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি শিশু ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এবং স্বাস্থ্যহানি হচ্ছে। ৩০ শতাংশ শিশু ঠিক মতো বেড়ে উঠছে না, ওজনও কম থাকছে।

দারিদ্র ও ক্ষুধার ভয়াবহতার সাথে চিকিৎসা খরচ যুক্ত হয়ে সাধারণ মানুষের আর্থিক ক্ষমতার অবশিষ্টটুকুও হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। ভোগবিলাসের পণ্যের মতোই রাষ্ট্রের ছাড়পত্র ও আইনি বৈধতা নিয়ে এক শতাংশ মালিক খাদ্য-শিক্ষা ও চিকিৎসাকে তাদের অবাধ মুনাফা লুঠের নিশ্চিত জায়গা বানিয়েছে। শিল্পে ভয়াবহ মন্দা ও বাজার সংকটের কারণে মালিকদের জমে থাকা অলস বৈধ-অবৈধ পুঁজি জনজীবনের অত্যাবশ্যক খাদ্য-শিক্ষা-চিকিৎসার ক্ষেত্রকে নিশ্চিত ও সহজ উচ্চ মুনাফার ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছে। রাষ্ট্র এবং যে কোনও দলের সরকার মালিকদের সহায়।

এমনই কঠিন ও কঠোর বাস্তব পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রচারিত আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সিইও ইন্দুভূষণ বলেছেন, ''ব্যাপারটা যেন বালতির ছিদ্রের মতো। মানুষকে দারিদ্রসীমার বাইরে নিয়ে আসার অনেক চেষ্টা চলছে। কিন্তু চিকিৎসা খরচের জন্য বহু মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছেন''। তাঁর আরও বক্তব্য, চিকিৎসা ব্যয়ের বোঝা বইতে গিয়ে প্রতি বছর নতুন করে ছয় কোটি মানুষ ফের দারিদ্রসীমার নীচে চলে যাচ্ছেন। কোনও সংসদীয় দলের বা মন্ত্রীর সদিচ্ছায়, ভাষণে বা ভোটের সময় দেওয়া হাজারো প্রতিশ্রুতিতে যে এই প্রক্রিয়া থেমে যাবে না— তা স্বাধীনতার ৭১ বছরে প্রমাণিত।

বজ্রদ্দোজা, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান

শবরীমালা ঃ ধর্মবিশ্বাসের আড়ালে কুসংস্কারই ভরসা বিজেপির

কোনও প্রচলিত সংস্কার বা কুসংস্কার, হোক তা প্রাচীন, কিংবা একেবারেই অর্বাচীন— তার কোনও পরিবর্তন করা যাবে না! মহাকাশ জয় করতে চাওয়া, 'আধুনিক' 'ডিজিটাল' ভারত চালিত হবে এমন ফরমানের জোরে!

দেশের শাসক বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির হুঙ্কার শুনলে বোঝা যায় ঠিক এই পরিকল্পনাতেই এগোচ্ছে বিজেপি। সম্প্রতি কেরালায় গিয়ে শবরীমালা মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশাধিকার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টকেই হুমকি দিয়েছেন অমিত শাহ। শবরীমালা পর্বতের উপর অবস্থিত শাস্তা আয়াপ্পান মন্দিরে ১০-৫০ বছর বয়সী মহিলাদের প্রবেশ বেশ কিছু দিন ধরে নিষিদ্ধ। কথিত আছে শবরীমালার প্রধান বিগ্রহ আয়াপ্পা ব্রহ্মচারী। প্রচলিত বিশ্বাস ঋতুযোগ্য মহিলারা মন্দিরে প্রবেশ করলে দেবতার কৌমার্য ব্রত ভেঙে গিয়ে মন্দির অপবিত্র হতে পারে।

এই বৈষম্যমূলক প্রথার বিরুদ্ধে ২০১৬ সালে সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিল 'ইন্ডিয়া ইয়ং ল ইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন'। এই বছর ২৮ সেপ্টেম্বর মামলার রায়ে এই মন্দিরের দ্বার যে কোনও বয়সী মহিলাদের জন্য খুলে দেওয়ার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ রায় দিয়েছে 'এই নিয়ম অস্পৃশ্যতার মতো অনৈতিক, বেআইনি এবং সংবিধান বিরোধী'। এই রায়ের প্রসঙ্গেই বিজেপি সভাপতি কেরালায় গিয়ে বলে এসেছেন, আদালতের এমন রায় দেওয়াই উচিত নয় যা কার্যকর করা যাবে না। কারণ এটাই প্রচলিত বিশ্বাস। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরোধিতায় 'পাহাড়ের মতো' দাঁড়াবার প্রতিশ্রুতিও তিনি দিয়ে এসেছেন। অর্থাৎ কোনও সংস্কার বা প্রথা বৈষম্যমূলক, কোনও গোষ্ঠীর মানুষের প্রতি অবমাননাকর, অন্যায়, অবৈজ্ঞানিক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে প্রতিপন্ন হলেও আধুনিক মন নিয়ে যুক্তির আলোকে তাকে বিচার করা চলবে না। এই হল বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির অভিমত। এমনকী সংবিধান মানা, গণতন্ত্র রক্ষার যে বুলি তাঁদের মুখে অহরহ শোনা যায়, তার অন্যতম স্তম্ভ সুপ্রিম কোর্টকেও নস্যাৎ করে দিতে তাঁর আটকায়নি।

প্রসঙ্গত, শবরীমালা মন্দিরের যে বিশ্বাসের কথা এখানে বলা হচ্ছে তার প্রধান ভিত্তি হচ্ছে 'নারী নরকের দ্বার' বলে প্রচারিত অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল অন্ধবিশ্বাস। যার থেকে জন্ম নেয় নারীর স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় এবং প্রাকৃতিক ঘটনার উপরেও অপবিত্রতার তকমা লাগিয়ে দেওয়ার জঘন্য মানসিকতা। এই কূপমণ্ডুকতা এবং অন্ধতা যা ধর্মের নামে বহু যুগ ধরে চলছে তার বিরুদ্ধে এ দেশে লড়েছেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, জ্যোতিবারাও ফুলে থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র সহ নবজাগরণের মনীষীরা সকলেই। দুনিয়া জুড়ে যেখানেই নবজাগরণের ঢেউ উঠেছে সেখানেই ধর্মের নামে এই রকম অন্ধতা, কূপমণ্ডুক চিন্তা-ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে লড়াই করে এগোতে হয়েছে। বিজেপি সভাপতি যে সওয়াল করেছেন তা ভারতীয় এই সমস্ত মনীষীদের চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

মন্দিরে একটি প্রথা দীর্ঘদিন চলে আসছে মানেই কি তা সঠিক? তাহলে তো সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহের মতো প্রথাকে ফিরিয়ে আনতে হয়! অমিত শাহরা ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করতে গিয়ে এই সর্বনেশে পথকেই বেছে নিচ্ছেন।

ওই মন্দিরের পূজিত বিগ্রহে বৌদ্ধ এবং অনার্য দ্রাবিড় রীতির সংমিশ্রণ ঘটেছে। অমিত শাহরা যে উচ্চবর্ণের উগ্র হিন্দুত্বের ধ্বজাকে তুলে ধরতে চান, লোকবিশ্বাসের প্রচলিত শাস্তা-আয়াপ্পানের অবস্থান তার বিপরীতে। আয়াপ্পান বস্তুত দ্রাবিড় অনার্য দেবতা, আর শাস্তা নামটি বৌদ্ধ রীতির ফসল। একসময় উচ্চবর্ণভুক্ত শাসকের অত্যাচার থেকে বাঁচতে দরিদ্র প্রান্তিক তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষ বৌদ্ধ ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এ দেশের নানা লোকবিশ্বাসের রীতিতে এই ধরনের সংমিশ্রণের প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু বিজেপি-আরএসএসের ধারণায় ভারতীয়ত্ব মানে বর্ণভেদ এবং নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য মেনে চলা। আয়াপ্পানের মতো লোকবিশ্বাসের দেবতাকে নিয়ে তাদের এতদিন মাথাব্যথাও ছিল না। এদিকে ২০১৯-এর লোকসভা ভোটের বৈতরণী পার হতে তাদের ঝুলিতে এমন পারানির কড়ি নেই যা দিয়ে তারা উৎরে যেতে পারে। ফলে কুসংস্কার, ধর্মীয় সেন্টিমেন্টের সুড়সুড়ি, সাম্প্রদায়িক বিভেদ এগুলিই তাদের সম্বল। যদিও একথা বলা দরকার, ওই মন্দিরে বিশেষ বয়সের মহিলাদের প্রবেশে নিষেধোজ্ঞা যুগ যুগ ধরে ছিল না।

কোনও জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাসে চালু আছে বলেই যদি যে কোনও প্রথা পবিত্র এবং অপরিবর্তনীয় হয় তাহলে মুসলিম সমাজে তিন তালাক প্রথার তো পরিবর্তন করা চলে না! তাহলে বিজেপি হঠাৎ তিন তালাকের বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেছে কেন?

ওই মন্দিরের পাশেই একটি মসজিদ ও একটি গির্জাও আছে। বহু বছর ধরে শবরীমালা মন্দিরের ভক্তরা বৌদ্ধ রীতিতে 'শরণম' বলতে বলতে পৌঁছান। তাঁদের বেশিরভাগই মন্দির, মসজিদ, গির্জা তিনটিই দর্শন করেন। এখানে কোনও বিভেদ ছিল না। ১৯৫০ সালে একটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কুসংস্কারের ঢেউ তোলে একদল স্বার্থান্বেষী। তারপর থেকে নানা বিতর্ক চলতে চলতে ১৯৯১ সালে এসে মহিলাদের প্রবেশাধিকার বন্ধ হয়। ফলে এটি আদৌ প্রাচীন বিশ্বাসের বিষয় নয়। একেবারেই নবীন কুসংস্কার।

কোনও জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাসে চালু আছে বলেই যদি যে কোনও প্রথা পবিত্র এবং অপরিবর্তনীয় হয় তাহলে মুসলিম সমাজে তিন তালাক প্রথার তো পরিবর্তন করা চলে না! তাহলে বিজেপি হঠাৎ তিন তালাকের বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেছে কেন? আসলে এখানেও কাজ করেছে তাদের ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি। মুসলিম মহিলাদের প্রতি দরদ নয়, তাঁদের শিখণ্ডী খাড়া করে মুসলিমবিরোধী প্রচার তোলা এবং হিন্দুত্ববাদের জিগির তোলাই তাদের আসল উদ্দেশ্য। শবরীমালাতেও ধর্ম নয়, বিজেপির লক্ষ্য ভোট। বিদ্যাসাগর একদল ধর্মধ্বজীকে দেখে বহু দুঃখে লিখেছিলেন, ''তাঁহারা শাস্ত্রেরও উমেদার নহেন, ধর্মেরও উমেদার নহেন, তাঁহারা উমেদার পয়সার'' (*ব্রজবিলাস*)। ঠিক তেমন করেই বিজেপি ধর্মের নামে আসলে উমেদার ভোটের। হিন্দু ধর্মের অন্যতম প্রবক্তা বিবেকানন্দ আজ বেঁচে থাকলে বিজেপির এই সব কাজকর্ম দেখে নিশ্চয়ই স্মরণ করিয়ে দিতেন, ''গোঁড়াদের গোঁড়ামির কারণ এই যে, তাহারা এই গোঁড়ামি করিয়া নিজেরা কিছু লাভের প্রত্যাশা করে।'' *(বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড পৃঃ ৮৩)* বিজেপিও আসলে গদি লাভের প্রত্যাশায় ভোটরাজনীতির সর্বনাশা খেলায় অন্ধবিশ্বাসকে হাতিয়ার করেছে। এই একই উদ্দেশ্যে কংগ্রেস সুপ্রিম কোর্টের শবরীমালা সংক্রান্ত রায়কে দিল্লি থেকে সমর্থন জানাচ্ছে অথচ কেরালার মাটিতে ঠিক বিজেপির সুরেই ঐতিহ্যের ধুয়ো তুলে মহিলাদের মন্দিরে প্রবেশাধিকারে বাধা দিচ্ছে। এমনিতেই আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের গান্ধীবাদী আপসমুখী নেতাদের দৌলতে কুসংস্কার, জাতপাত-ধর্ম-বর্ণ বিভেদ, ধর্মের নামে নারীর প্রতি অবমাননাকর দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন জোরদার হয়ে গড়ে উঠতে পারেনি। স্বাধীনতার পর শাসক শ্রেণির মদতে এই সমস্ত আরও বেশি করে সমাজের বহু গভীরে গেড়ে বসেছে। কংগ্রেস এগুলিকে সবসময়েই মদত দিয়েছে। বিজেপি ক্ষমতায় বসার পর আরও নগ্নভাবে এবং দ্রুততার সাথে এগুলির প্রসারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আরএসএসের চিন্তা অনুসারে নারীর স্থান হল অন্তঃপুরে। পুরুষের সেবাই নারীর একমাত্র কর্তব্য— এই চিন্তাকেই ভারতীয়ত্বের নামে প্রচার করে তারা। অথচ এই ঐতিহ্যকে বহু পিছনে ফেলে ভারতের বুকেই নবজাগরণের আধুনিক চিন্তা প্রতিষ্ঠার জন্য যে মনীষীরা লড়েছেন আরএসএসের চিন্তা তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। শরৎচন্দ্র লিখছেন, ''যে ধর্ম বনিয়াদ গড়িয়াছে আদিম জননী ইভ-এর পাপের উপর, যে ধর্ম সংসারের সমস্ত অধঃপতনের মূলে নারীকে বসাইয়া দিয়াছে, সে ধর্ম সত্য বলিয়া যে কেহ অন্তরের মধ্যে বিশ্বাস করিয়াছে, তাহার সাধ্য নয় নারীজাতিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে।'' *(নারীর মূল্য)* এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলার জন্যই দিল্লিতে নির্ভয়ার উপর নৃশংস ধর্ষণের ঘটনায় আরএসএস প্রধান মেয়েটিকেই দায়ী করেছিলেন।

যুক্তিহীন মানসিকতার সাথে বিজ্ঞানের শুধুমাত্র কারিগরি দিকের মিশেল, আর তার সাথে ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতা, ঐতিহ্যবাদ, কুসংস্কার ইত্যাদির সংমিশ্রণে যে যুক্তিহীন, যান্ত্রিক, অন্ধতাপূর্ণ মনন তৈরি হয় তাই হল ফ্যাসিবাদের ভিত। ফ্যাসিবাদ গড়ে উঠলে দেশে যুক্তিবাদ থাকে না, মানুষ গড়ে ওঠার পথটাই সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে যায়। শাসকের অত্যাচারী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে মানুষের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ যাতে বিপ্লবী আন্দোলনের পথে যেতে না পারে তার জন্য পুঁজিপতি শ্রেণি এই ফ্যাসিবাদকেই শেষ আশ্রয় হিসাবে আঁকড়ে ধরে। বিজেপি-কংগ্রেস সহ সমস্ত শাসক শ্রেণির দল এই লক্ষ্যেই কাজ করে যায়।

কেরালার শাসক সিপিএমও শবরীমালা প্রশ্নে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে পারেনি। এই রাজ্যে তারা বারবার ক্ষমতায় থেকেছে, কিন্তু দলের কর্মী-সমর্থক এবং তাদের সমর্থক বিরাট সংখ্যার জনসাধারণের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার সঠিক ধারণাকে নিয়ে যায়নি। বরং ভোটে জিততে বহু সময় ধর্মীয় সেন্টিমেন্টকেই ব্যবহার করেছে। তাদের অ-বাম রাজনীতির ফলে অন্ধবিশ্বাসের যে জমি তৈরি হয়েছে আজ তা ব্যবহার করছে বিজেপি।

এই দুষ্ট রাজনীতি এবং কুসংস্কারকে পরাস্ত করে নারীর যথার্থ সম্মান এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে হলে সঠিক বামপন্থী আদর্শের ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলাই একমাত্র পথ।

পুরুলিয়ায় চাষি আন্দোলনের জয়

পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর ১ নং ব্লকের নূতনডি অঞ্চলে শিল্পতালুক গড়ার নাম করে ২০০৭ সালে বাম আমলে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগম বিপুল পরিমাণ কৃষিজমি ন্যায্য ক্ষতিপূরণ না দিয়ে জলের দরে অধিগ্রহণ করেছিল। তখন এলাকার মানুষকে শিল্পায়নের অনেক স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল। বলা হয়েছিল, কোটি কোটি টাকা সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ হবে। কিন্তু কোথায় কী? একমাত্র ডিভিসি-র একটি পাওয়ার প্ল্যান্টের কাজ চলা ছাড়া আর কিছুই হয়নি। ভবিষ্যতেও শিল্পতালুক গড়ে ওঠার কোনও সম্ভাবনা নেই। মাঝখান থেকে চাষের জমি হারিয়ে সাধারণ চাষি দু'মুঠো অন্নের জন্য হাহাকার করছে। বাধ্য হয়েই জমিহারা চাষিরা নূতনডি অঞ্চল কৃষিজমি অধিকার রক্ষা কমিটি গঠন করে অধিগৃহীত পতিত জমিতে যার যেখানে জায়গা ছিল সেখানেই বেশ কয়েক বছর ধরে ধানচাষ করে আসছেন। এ বছরেও চাষিরা যথারীতি ধানচাষ করেছিলেন। কিন্তু গত জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় সংস্থা গেইল হঠাৎই চাষিদের সঙ্গে কথা না বলে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ফসলভরা ওই অধিগৃহীত জমিতে গ্যাসের পাইপ লাইন বসানোর কাজ শুরু করে। এই রাজ্যের হলদিয়া থেকে শুরু করে ঝাড়খণ্ডের বোকারো পর্যন্ত এই পাইপ লাইন বসানো হবে। এই কাজের জন্য তারা সাত ফুট গর্ত করে প্রায় একশো ফুট চওড়া করিডর তৈরি করা শুরু করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই চাষিদের ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

এলাকার চাষিরা নূতনডি অঞ্চল কৃষিজমি অধিকার রক্ষা কমিটির আহ্বানে একজোট হয়ে পাইপ লাইন বসানোর কাজে বাধা দেন এবং তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁদের দাবি ছিল— ১) নষ্ট হয়ে যাওয়া ফসলের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ২) শিল্পোন্নয়ন নিগম যে ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল তা যথেষ্ট নয়, তাই ন্যায্য ক্ষতিপূরণের মূল্য স্থির করে জমিহারাদের বাড়তি অর্থ দিতে হবে এবং ৩) শিল্পের নামে নেওয়া অব্যবহৃত সমস্ত জমি চাষিদের ফিরিয়ে দিতে হবে।

এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৬ আগস্ট সরকার, কৃষিজমি রক্ষা অধিকার কমিটি ও গেইল-এর মধ্যে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে গেইল চাষিদের ফসলের নির্ধারিত মূল্যের ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকৃত হয়। চাষিরাও অবরোধ তুলে নেন। কিন্তু গেইল ক্ষতিপূরণ দিতে টালবাহানা করায় তাঁরা আবার পাইপ লাইন বসানোর কাজ বন্ধ করে দেন। প্রায় দু'মাস কাজ বন্ধ করে রাখার ফলে কিছুদিন আগে গেইল ক্ষতিপূরণের টাকা মিটিয়ে দিতে বাধ্য হয়। নিঃসন্দেহে গণআন্দোলনের এ এক বিরাট জয়। নূতনডি অঞ্চল কৃষিজমি অধিকার রক্ষা কমিটির সম্পাদক কমরেড মণিলাল মাজী জানিয়েছেন, মানুষের অন্যান্য দাবি নিয়েও আন্দোলন চলবে।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি) দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার পাথরপ্রতিমা অঞ্চলের প্রবীণ কর্মী কমরেড অশোককুমার পণ্ডা ১৯ নভেম্বর ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। প্রথম জীবনে তিনি কংগ্রেসের রাজনীতির সাথে যুক্ত থাকলেও কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসার পর তাঁর জীবনবোধ পাল্টে যায় এবং কংগ্রেস দলের সাথে ছেদ ঘটিয়ে এস ইউ সি আই (সি) দলের সাথে তিনি যুক্ত হন। সমস্ত প্রকার শোষণ-অত্যাচারমুক্ত সমাজ গঠনের স্বপ্ন নিয়ে দলের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু করেন।

তিনি ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষক। স্থানীয় শিক্ষানুরাগী মানুষজনকে নিয়ে তিনি শিক্ষা আন্দোলন পরিচালনা করেছেন, বিশেষত প্রাথমিকে ইংরেজি ও পাশ-ফেল ফিরিয়ে আনার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। এলাকায় সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলা ও মনীষীদের জীবনীচর্চার মাধ্যমে জরুরি অবস্থার সময়েও দলের বক্তব্য জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। গরিব মানুষের প্রতি দরদি এই মানুষটি দরিদ্র ভাগচাষিদের উপর অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে এবং এলাকায় মদ-জুয়া প্রতিরোধের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতেন।

এলাকায় বাগ্মী ও বুদ্ধিজীবী হিসেবে তাঁর যথেষ্ট পরিচিতি ছিল। পরিবারের সকলকেই তিনি দলের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করে গেছেন। শেষ বয়সে শারীরিক অসুস্থতার কারণে সক্রিয়ভাবে দলের কাজ করতে না পারলেও তিনি খোঁজখবর রাখতেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দলের শক্তি বৃদ্ধি কামনা করে গেছেন। কমরেড অশোক পণ্ডার প্রয়াণে দল একজন মূল্যবান কমরেডকে হারাল। ১ ডিসেম্বর পাথরপ্রতিমা বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাকক্ষে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড অশোককুমার পণ্ডা লাল সেলাম

ধান ওঠার শুরুতেই বস্তা পিছু দাম কমল দুশো টাকা

যখনই চাষিদের ঘরে কোনও ফসল ওঠে তখনই সেই ফসলের বাজারদর পড়ে যায়। নানা জায়গা থেকে ঋণ করে চাষি, সেই ঋণ শোধের তাড়া থাকে তাদের। ফলে কম দামেই ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হয় চাষি। সরকারের ঘোষিত সহায়ক মূল্যে চাষিদের কাছ থেকে ওই ফসল কেনার কথা সরকারের। অথচ প্রতিবারই সরকারি সংস্থা ফসল কিনতে মাঠে নামে অনেক দেরি করে। কেন দেরি করে? ব্যবসায়ী ও ফড়ে বা মধ্যস্বত্বভোগীদের স্বার্থেই সরকারের এই দেরি করে মাঠে নামা। কারণ শাসকদলের ভোট কেনার খরচের টাকার জোগানদার এরাই। তা ছাড়া সরকারের কাছে ফসল বিক্রি করে তার টাকা চাষিদের হাতে পেতে চাষিদের যে নিয়ম-কানুনের জটিলতার মধ্যে পড়তে হয় এবং যতটা দেরি হয় তাতে তাদের ঘরের পান্তা ফুরিয়ে যায়। এ দিকে প্রতি বছর চাষের উপকরণের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। অন্যদিকে চাষিরা ফসলের ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অভাবি বিক্রি করতে তারা বাধ্য হচ্ছে।

এখন চাষির ঘরে আমন ধান উঠছে। এই সময় বস্তা প্রতি (৬০ কেজি) ধানের দাম কমেছে প্রায় দুশো টাকা। এই সংকটের মধ্যে নিরুপায় হয়ে চাষিরা ফড়ে-মহাজনদের হাতেই ধান বেচতে বাধ্য হচ্ছেন। পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্যতম কৃষিপ্রধান মহকুমা কালনা। এই মহকুমার পাঁচ ব্লকেই ধান চাষ হয়। মহকুমার মন্তেশ্বর ব্লকের মুখ্য ফসলই হল ধান। বিগত চার বছরের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, কৃষি উপকরণ বিশেষ করে সারের দাম বেড়েছে ব্যাপক হারে।

অথচ ধানের দাম এক টাকাও বাড়েনি। কিছুদিন আগেও স্বর্ণ ধান এক বস্তা বিক্রি হয়েছে হাজার টাকার আশেপাশে। বর্তমানে সেই এক বস্তা ধান বিক্রি হচ্ছে আটশো টাকায়। এদিকে এখনও সরকারিভাবে ধান কেনা শুরু হয়নি। অনেকে বলছেন, সরকারিভাবে নামের তালিকা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। যদিও ভুক্তভোগী চাষিরা সেখানে যাবেন কি না সন্দেহ। চাষিদের সেই ফড়েদেরই শরণাপন্ন হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ এআইকেকেএমএস-এর। বর্তমানে আলু বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। এর জন্য চাষিদের টাকার প্রয়োজন। তাই অপেক্ষা না করে তড়িঘড়ি ধান বেচতে চান চাষিরা। তা ছাড়া সরকারিভাবে ধান বিক্রি তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতেও রয়েছে নানা জটিলতা। ধরাধরি করে ওই তালিকায় নাম নথিভুক্ত করাতে গেলে চাষিদের বেশ কিছু 'ব্যয়' করতে হয়। এখানেই শেষ নয়, ধান ওজনের সময় কুইন্টাল পিছু ৫ কেজি ধান বাদ যায়। ফলে বাজারে বিক্রির থেকে সরকারি সহায়ক মূল্যে বিক্রির মধ্যে খুব একটা পার্থক্য থাকে না।

ঠিক এই সুযোগটির অপেক্ষাতেই থাকে ফড়ে-মহাজনরা। প্রতি বছরই দেখা যাচ্ছে সরকারি ঘোষণা যাই থাক ধানকলগুলি, সরকারি ধানক্রয় কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে ধান বিক্রি হয় খুবই সামান্য। শাসক দলের কেষ্ট-বিষ্টুদের মদতে ফড়েরাই চাষিরূপে ধান বিক্রি করে সহায়ক মূল্য লুটে নেয়। চাষির ঘরে অভাব ঘোচে না।

এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে এআইকেকেএমএস। জেলায় জেলায় অবরোধ, বিক্ষোভ, ডেপুটেশনের মধ্য দিয়ে বহু স্থানে ন্যায্যমূল্য চাষিরা আদায়ও করেছেন।

'আচ্ছে দিনে'ও পেঁয়াজ চাষির চোখের জল ঘুচল না

মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের কৃষকরা পেঁয়াজ বিক্রি করতে বাজারে এসে চোখের জলে ভাসছেন। পেঁয়াজের ন্যায্য দাম তো দূরের কথা, প্রতি কেজি পেঁয়াজের দাম ৫০ পয়সায় বিক্রি করতেই হিমশিম খাচ্ছেন তাঁরা। দেশ জুড়ে পেঁয়াজ চাষিদের মাথায় হাত। যে পেঁয়াজ আড়তদাররা ৫০ পয়সা কেজি দরে কিনে নিচ্ছে সেই পেঁয়াজ খচরো বাজারে এখনই বিকোচ্ছে ২৫ থেকে ৩০ টাকা কেজি। গরমকালে তার দাম হবে ৫০-৬০ টাকা কেজি। প্রতি বছরই এই ঘটনা ঘটছে। সরকার সব জেনেও চুপচাপ, কারণ এই আড়তদার ও মধ্যস্বত্বভোগীরাই শাসকদলগুলির ভোটের খরচ জোগান দেয়। ফলে কৃষকদের এই চরম দুর্গতি-চোখের জল কেন্দ্র ও রাজ্যের ক্ষমতাসীন শাসকদের পাষাণ হৃদয় গলাতে পারে না। পেঁয়াজ চাষিদের পিঠ আজ দেওয়ালে ঠেকে গেছে।

দেশের প্রায় অর্ধেক পেঁয়াজ ফলে এই নাসিকেই। আর সেখানে কৃষক পেঁয়াজ বেচে কেজিতে এক টাকার অর্ধেকও পাচ্ছেন না। এই নাসিকের পেঁয়াজচাষি সঞ্জয় সাঠে দাম পেয়েছেন কেজি প্রতি ১ টাকা ৪০ পয়সার কাছাকাছি। এরই প্রতিবাদ জানাতে ৭৫০ কেজি বিক্রির ১০৬৪ টাকার গোটাটাই মানি অর্ডার করে পাঠিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে। মানি অর্ডারের জন্য বাড়তি ৫৪ টাকা মাশুলও দিতে হয়েছে তাঁকে। সংবাদসংস্থা পিটিআইকে তিনি বলেছেন, চার মাস মাঠে হাড়ভাঙা খেটে ফলাতে হয়েছে এই পেঁয়াজ। সার, বীজ, জল, কীটনাশক, বিদ্যুতের জন্য খরচ হয়ে গিয়েছে প্রচুর টাকা। এর পরও এত কম দাম মিলেছে। এই টাকা পাওয়া, না পাওয়া সমান। এই সঞ্জয় সাঠের একটা বিশেষ পরিচয় আছে। ২০১৫ সালে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার ভারত সফরের সময় সঞ্জয়কেই ভারতের কৃষকের সমৃদ্ধির প্রতীক বলে দেখিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আজ সেই সঞ্জয়ের দুর্দশা দেশের চাষিদের প্রকৃত দশাকেই তুলে ধরেছে। তাঁর মতোই ওই জেলার আরেক পেঁয়াজ চাষিও ফসলের দাম পড়ে যাওয়ায় সেই প্রতিবাদের পথ নিলেন। নাসিক জেলার ইয়োলা তহশিলের আনদারসুল গ্রামের কৃষক চন্দ্রকান্ত ভিখান দেশমুখ পেঁয়াজ বিক্রির ২১৬ টাকা মানি অর্ডার করে পাঠিয়ে দিয়েছেন রাজ্যের বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশকে।

ইয়োলার এগ্রিকালচার প্রডিউস মার্কেট কমিটি (এপিএমসি) তে তাঁর ফলানো ৫৪৫ কেজি পেঁয়াজ নিলামে চড়িয়ে দেশমুখ দাম পেয়েছেন কেজি প্রতি মাত্র ৫১ পয়সা। তার মধ্যে থেকে এপিএমসি-র চার্জ বাদ দিয়ে দেশমুখের হাতে এসেছে শুধুই ২১৬ টাকা। সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের প্রতিনিধিকে সেই রসিদ দেখিয়ে দেশমুখ বললেন, "আমাদের এলাকায় তো খরার মতো পরিস্থিতি। কী করে সংসার চালাবো, ধার মেটাবো কে জানে?" মন্ত্রীদের শুকনো কথার ফুলঝুরিতে যে চাষির চিঁড়ে ভেজে না তা বোঝাতেই ওই ২১৬ টাকা পাঠিয়ে তিনি মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠিয়েছেন।

গত ২৯-৩০ নভেম্বর দিল্লির কিষান বিক্ষোভের অন্যতম প্রধান দাবিই ছিল ফসলের ন্যায্য দাম। দিল্লির সংসদ অভিযানে ফসলের লাভজনক দামের দাবি তুলেছেন কৃষকরা। সেই লক্ষ্যে সংসদে আইন প্রণয়নের দাবি জানাচ্ছেন কৃষকরা। তুলেছেন ঋণ মকুবের জন্য আইন তৈরির দাবি। দেশের অন্য প্রান্তের সঙ্গে মহারাষ্ট্র থেকেও বিপুল সংখ্যায় সমাবেশে যোগ দিয়েছেন কৃষকরা। যোগ দিয়েছে দেশের দুশোটির বেশি কৃষক সংগঠন।

কৃষকদের এই ন্যায্য ক্ষোভকে আবার ভোটের বাক্সে পুরে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টাও চলছে। সচেতন কৃষককে বুঝতে হবে, ভোট দিয়ে সরকারের সাইন বোর্ড পাল্টে নয়, লড়াইয়ের পথেই তাঁদের ন্যায্য দাবি আদায় করতে হবে।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS/138/2016-18

শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সভা

শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চের ডাকে ৬ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক সৌধ বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কালা দিনে কলকাতার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর সামনে রাণুছায়া মঞ্চে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বক্তা প্রতুল মুখোপাধ্যায়। মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্টজনেরা

প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল বিমল চ্যাটার্জী, অধ্যাপক মীরাতুন নাহার, গীতেশ শর্মা, আইনজীবী পার্থসারথি সেনগুপ্ত, ডাঃ তরুণ মণ্ডল, অধ্যাপক শাহনাজ নবি, সুজাত ভদ্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছবি আঁকা, আবৃত্তি, গান ও আলোচনা এ সবের মধ্য দিয়ে দিনটি পালিত হয়। সভাপতিত্ব করেন মঞ্চের সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী। উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরে হিন্দুত্ববাদীদের তাণ্ডবে পুলিশ ইন্সপেক্টর সুবোধ কুমার সিং-এর খুন হওয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা করা হয়।

রঙে-রেখায় শিল্পীরা সোচ্চার

বন্ধ চটকল খুলতে সরকারকে উদ্যোগী হওয়ার দাবি এ আই ইউ টি ইউ সি-র

এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য ৫ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

"পশ্চিমবঙ্গে একের পর এক চটকল বন্ধ করে দিচ্ছে মালিকরা। ইতিমধ্যে হুগলি জেলায় ১০ সহস্রাধিক চটকল শ্রমিক ৭ মাস ধরে কর্মহীন। এ সপ্তাহে ওই জেলার হেস্টিংস ও নর্থ ব্রুক জুট মিল, উত্তর ২৪ পরগণার কামারহাটি জুটমিল ও কলকাতার হুগলি জুট মিল মালিকরা বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে আরও ২০ হাজার শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। বাস্তবে শ্রমিক পরিবারের সন্তান-সন্ততি সহ লক্ষাধিক মানুষ আজ অনাহার ও অর্ধাহারে দিন যাপন করছেন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মালিকদের এই স্বেচ্ছাচার ও অন্যায়কে মদত দিচ্ছে এবং মিল খোলার ক্ষেত্রে কোনওরূপ কার্যকরী ব্যবস্থা নিচ্ছে না। আমাদের দাবি, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে তৎপর হয়ে অবিলম্বে নিঃশর্তে মিলগুলি খোলার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা সকল চটকল শ্রমিক ও সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষকে বন্ধ চটকলগুলি খোলার দাবিতে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি"।

শিয়ালদহ কোর্টের অচলাবস্থার প্রতিবাদ

সম্প্রতি শিয়ালদহ কোর্টের ৩ ও ৪ নং কোর্টকে যথাক্রমে সল্টলেক ও ব্যারাকপুরে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। আইনজীবী, করণিক সহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা না করেই অত্যন্ত দ্রুত এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে কোর্টে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, সাধারণ মানুষ অত্যন্ত অসুবিধায় পড়েছে। তাছাড়া যেখানে এই কোর্টগুলি স্থানান্তরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে এখনও উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়নি। একথা জানানো হয়েছে লিগাল সার্ভিস সেন্টারের পক্ষ থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করে ৭ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে। বিবৃতিতে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ভবেশ গাঙ্গুলী সমস্যাগুলির সমাধানে সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করার আবেদন জানিয়েছেন হাইকোর্টকে।

বার অ্যাসোসিয়েশনের অবস্থান

ছাত্রী মৃত্যুর প্রতিবাদে নাগরিক কনভেনশন

দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী সায়নী শীলের অস্বাভাবিক মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ১ ডিসেম্বর উত্তর ২৪ পরগণার আগরপাড়াতে নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সায়নীর বাবা-মা, পরিবারের অন্যান্যরা, স্কুলের শিক্ষিকা, এলাকার বিশিষ্ট জন সহ শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া চিকিৎসক সজল বিশ্বাস, নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির সম্পাদিকা কল্পনা দত্ত ও মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষে রত্না দত্ত উপস্থিত ছিলেন।

২৮ নভেম্বর পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া লেভেল ক্রসিংয়ের সামনে জনবহুল এলাকায় দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীকে এক দুষ্কৃতী হত্যা করে। এই মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিবাদে ২ ডিসেম্বর পাঁশকুড়া নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির উদ্যোগে মোমবাতি মিছিল। বহু নাগরিক এতে অংশগ্রহণ করেন।

টাকা দিচ্ছি, পরিষেবা পাব না কেন—ক্ষুব্ধ ফুলবাজার

কোলাঘাট ফুলবাজার পরিচালন সমিতির তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় ৭ ডিসেম্বর। প্রায় তিনশো ফুলচাষি, ফুল ব্যবসায়ী, পাল্লাওয়ালা, দোকানদার, মুটেমজুর অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধিরা ক্ষোভের সাথে বলেন, রেলদপ্তর প্রতি চাষির কাছ থেকে ১০ টাকা করে ফেরিওয়ালা টিকিট চার্জ আদায় করলেও প্রয়োজনীয় পরিষেবাটুকু দিচ্ছে না। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে জানুয়ারিতে রেলদপ্তর অভিযানের কর্মসূচি গৃহীত হয়।

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলির ডাকে ৮-৯ জানুয়ারি দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে ৮ ডিসেম্বর দুর্গাপুরে কনভেনশন। বক্তব্য রাখছেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সভাপতি কমরেড এ এল গুপ্তা

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com